চট্টগ্রামের সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

ফারহানা আজিজ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookFarhana

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত-বিভক্তির পর ভাষা বিষয়ে আন্দোলন শুরু হলেও ভাষা বিতর্কের সূচনা অনেক আগে থেকেই হয়েছিল। প্রথম দিকে ভাষা প্রশ্নটি সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে এটি জাতীয় রাজনীতির অন্যতম মূল বিষয় হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) হায়দ্রাবাদ শহরে উর্দু ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করে ভাষা বিতর্কের সূচনা করেন। এছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নানা ঘটনাপ্রবাহে এটা পরিষ্কার হয় যে, সরকারের লক্ষ্যও উর্দু ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা। ফলে পূর্ব-বাংলায় ক্রমশ প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকে বাঙালি লেখক ও সাংবাদিকগণ ভাষার বিষয়ে জোর তৎপরতা শুরু করেন। *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় ভাষার স্বপক্ষে পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক আব্দুল হকের 'বাংলাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ ২২ ও ২৯শে জুলাই দুই খণ্ডে *দৈনিক ইত্তেহাদ-এ* প্রকাশিত হয় (হক, ১৯৭৬, পৃ. ৪)। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এবং 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' শীর্ষক উক্ত লেখকের আরো দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ৩০শে জুন *দৈনিক আজাদ-এ* এবং ২৭শে জুলাই *দৈনিক ইত্তেহাদ-এ* প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলিতে লেখক বাঙালি সমাজে ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দির প্রতি পক্ষপাত এবং বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীনতার সমালোচনা করেন। এছাড়া, লেখক বাংলাভাষা ও সাহিত্য উর্দু ভাষার চাইতে অধিকতর উন্নত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা উর্দুভাষীর চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন (*দৈনিক ইত্তেহাদ*, ২৭শে জুলাই, ১৯৪৭)।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত উপরিউক্ত প্রবন্ধসমূহ নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রভাষা দাবির পক্ষে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। তবে এ-সময় সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (১৮৮৫-১৯৬৯) ভাষাভিত্তিক মন্তব্য। 'আমাদের ভাষা সমস্যা' এবং 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে বাংলাভাষা দাবির পক্ষে তিনি যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন, তা ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে (*দৈনিক আজাদ*, ২৯শে জুলাই, ১৯৪৭)। ১৯৪৮ সালে সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে যদি উর্দু চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানিরা একদিন বিদ্রোহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং কার্যত হয়েছিলও তাই (আলী, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮)।

এভাবে ভারত-বিভক্তির পূর্ব থেকেই উর্দু-বাংলা বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি বিভিন্নভাবে কার্যকর করা হয়। যেমন- পাকিস্তানের মুদ্রা, পোস্টকার্ড, এনভেলাপ, মানিঅর্ডার ফরম, রেটিকেট, ছাপানো টাকায় ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার, ১৯৪৮-

এর পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া (মতিন, ২০০৫, পৃ. ২৩)। ভাষার দাবির প্রশ্নে তখন থেকে কিছু কিছু সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কামরুদ্দীন আহমদের (১৯১২-১৯৮২) উদ্যোগে *গণ আজাদী লীগ*, একই বছর আগস্ট মাসে *গণতান্ত্রিক যুবলীগ*, ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যোগে *তমদ্দুন মজলিস* এবং ডিসেম্বরের প্রথম দিকে *রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুবলীগ ১৯৪৭-এর ৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর *তমদ্দুন মজলিস* কর্তৃক প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" শীর্ষক পুস্তিকায় বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করার দাবি জানায় (রহমান, ২০০১, পৃ. ২২)।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া এবং লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে *তমদ্দুন মজলিস* ও পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলন ব্যাপকভাবে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হলেও সারা দেশেই এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ছিল আন্দোলনের অন্যতম ক্ষেত্র। ভারত-বিভক্তির পূর্ব থেকে মাতৃভাষা বাংলার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান এবং আবহমান বাংলার সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান রাখতে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালে ভাষার প্রশ্নে বাংলার আপামর জনসাধারণকে উজ্জীবিত করার প্রত্যয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ে '৫২'র আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে সহায়তা করেছিল।

গবেষণা-পদ্ধতি

প্রবন্ধটি প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে রচিত, পাশাপাশি সহায়ক উৎস হিসেবে দ্বৈতয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভাষা আন্দোলনকালীন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। এ-সময় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে *দৈনিক পাঞ্চজন্য* (১৯২৯-১৯৫৩, সম্পাদক, অম্বিকাচরণ দাস), *সাপ্তাহিক সত্যবার্তা* (১৯৩৫-১৯৫০, সম্পাদক, পর্যায়ক্রমে গোলাম সোবহান মাস্টার, মোহাম্মদ ওমর ও কাজী কবিরউদ্দীন), *দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান* (১৯৪৭-১৯৭০, সম্পাদক, কবি আবদুস সালাম), *সীমান্ত* (প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৪৭, সম্পাদক, যথাক্রমে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী), *সাপ্তাহিক কোহিনুর* (প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৫০ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুল খালেক), *দৈনিক ইনসাফ* (১৯৫২-৫৩) এবং পরবর্তী সময়ে *দৈনিক পূর্বকোণ* (প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, সম্পাদক, মোহাম্মদ ইউছুফ চৌধুরী) পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভাষাসৈনিকদের স্মৃতিচারণ ও বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া, ভাষা আন্দোলনকালীন সময়ে প্রকাশিত সাহিত্যিক উপাদান ও বিভিন্ন মনীষীদের আত্মজীবনী প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক/দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রকাশিত প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, গেজেটিয়ার ও ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রধানত পাঠ-বিশ্লেষণ কৌশল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব ও চট্টগ্রাম

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালের ১৯ই মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮) পূর্ব-বাংলায় প্রথম সফর করেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) আগে থেকেই সোচ্চার ছিলেন। মোহাম্মদ

আলী জিন্নাহ্‌র ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে তিনি (ভাসানী) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) এবং শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্র ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করে ভাষার প্রশ্নে জিন্নাহ্‌র অবস্থানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কর্মসূচি প্রণয়ন করেন (এম. এ. হালিমের স্মৃতিচারণ)। ২১শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন: "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। জিন্নাহ্‌র এ ঘোষণার পর উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' (ইংরেজিতে 'নো-নো) বলে চিৎকার করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এদের মধ্যে একজন ছিলেন চট্টগ্রামের *পিপল'স ভিউ* পত্রিকার সম্পাদক (পরবর্তীতে) নূরুল ইসলাম (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ১৯)। একই বছরের ২৪শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সেই পুরনো সুরেই কথা বলেন (অন্য কোন ভাষা নয়, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা)। এ ঘোষণার সাথে সাথে একদল ছাত্র না না স্বরে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহ্ ছাত্রদের এরূপ আচরণে হতবাক ও ক্ষুব্ধ হন। ছাত্ররা ছিল তাদের দাবিতে অটল। শেষপর্যন্ত জিন্নাহ্ বিষয়টি অমিমাংসিত রেখে ঢাকা ত্যাগ করেন (মতিন, ২০০৫, পৃ. ৬৪)। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

জিন্নাহ্ তাঁর পূর্ব-বাংলার সফরসূচিতে চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং এ সফরে ছাত্র-প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জিন্নাহ্‌র চট্টগ্রাম সফরের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানোর জন্য ছাত্রদেরকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে শামসুল হককে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে আড়াল করে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য শামসুল হক সস্ত্রীক চট্টগ্রামে এসেছিলেন। চট্টগ্রামের তৎকালীন জননেতা এম. এ. আজিজ (১৯২১-১৯৭১) চকবাজারের একটি বাসায় নিয়ে শামসুল হককে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেই বাসা থেকেই তিনি চট্টগ্রাম কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জিন্নাহ্'র চট্টগ্রাম সফরের সময় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পশ্চিমাদের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটা রূপরেখা প্রণয়ন করেন (হালিম, ১৯৯৩)।

জিন্নাহ্‌র চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে দামপাড়া পুলিশ লাইনে এক জনসভার (১৯৪৮ সালের মার্চে) আয়োজন করা হয়। জনসভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা আহমেদ সগীর চৌধুরী। উক্ত সভায় তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য এ. কে. খানও (১৯০৫-১৯৯১) বক্তব্য রাখেন (রহমান, ১৯৯৩, পৃ. ২০১)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর ভাষণে "চট্টগ্রামকে সুন্দর নগরী করার প্রতিশ্রুতি" দিয়ে বাংলার স্বার্থ-বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য অতি নির্বিঘ্নে দিয়ে যান। এরপর জিন্নাহ্ ছাত্র-প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের সময় জিন্নাহ্ ছাত্র-প্রতিনিধিদেরকে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে পেশ করার জন্য বলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের ছাত্র প্রতিনিধিরা ইতিপূর্বে শামসুল হকের পরামর্শ মতে জিন্নাহ্'র সাথে আলোচনার জন্য যেসব দাবিনামা ঠিক করেছিলেন সেই কাগজটি (দাবিনামাটি) অনিচ্ছাকৃতভাবে ফেলে আসেন। ফলে জিন্নাহ্‌কে লিখিতভাবে কোনো দাবি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে লেখাপড়া করার হিতোপদেশ দিয়ে চলে যান। চট্টগ্রামে সে-সময় জিন্নাহ্‌কে ব্যাপক কোনো বিক্ষোভ দেখানো না গেলেও এর পরে ভাষার প্রশ্নে ছাত্রদের

মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা সৃষ্টি হতে শুরু করে এবং পরে তা পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় (হালিম, ১৯৯৩)।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব ও চট্টগ্রাম: সংবাদপত্রে প্রতিক্রিয়া

১৯৪৮ সালে জিন্নাহ্'র মৃত্যুর পর আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হলেও ১৯৪৯ সাল থেকে ভাষা বিতর্ক আবার শুরু হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য কৌশলী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে সরকারি প্রচেষ্টায় আরবি হরফে বাংলা উচ্চারণ কিংবা ইসলামি ভাবধারার আলোকে বাংলা ভাষার জন্য আরবি হরফ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারের এ-সকল প্রচেষ্টার পক্ষে-বিপক্ষে অন্যান্য জাতীয় পত্রিকার সাথে সাথে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি তাদের মতামত ও বক্তব্য উপস্থাপন করে।

১৯৪৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় আরবি হরফকে পাকিস্তানের ভাষার একমাত্র হরফ করার জোর সুপারিশ করেন এবং মুসলমানদেরকে বাংলার পরিবর্তে 'ইসলামী ভাষা' উর্দুকে গ্রহণের পরামর্শ দেন (মুসা, ১৯৭৪, পৃ. ২৫৯)। কিন্তু বাঙালিরা উর্দুকে ইসলামি ভাষা হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না। বাঙালিদের মতে, ইসলামি ভাষা হলো একমাত্র আরবি, উর্দু নয়। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, পাকিস্তান সরকারের উর্দু চাপানোর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় সংহতি বা ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে নয়, বরং বাঙালির উপর সর্ব-বিষয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল লক্ষ্য। সরকারের এরূপ তৎপরতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে *দৈনিক ইনসাফ* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়:

> পূর্ববঙ্গের ছেলে মেয়েরা বাঙালা বর্ণমালায় মাতৃভাষা শিখিলে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করিলে গোমরাহ বা ইসলামী ভাবধারা বিহীন হইয়া পড়িবে এই আশংকা কেন? সেই আশংকা যদি কাহারও মনে না থাকে তবে বর্ণমালা পরিবর্তনের জন্য কতৃপক্ষ মহলের এই অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন? (*দৈনিক ইনসাফ*, ২৩শে জুন ১৯৫২)।

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শনে এলে তাঁকে আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানের কারণে কলেজের দুইজন ছাত্রনেতাকে বহিষ্কার করা হয়। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে *দৈনিক পূর্বকোণ*-এ এক সাক্ষাৎকারে তখনকার ছাত্রনেতা এজহারুল হক এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন:

> খুব সম্ভব ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী চট্টগ্রাম সফরে আসেন। এই সফরকালে তাঁর চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শনের প্রোগ্রাম ছিল। এটা জানতে পেরে ফরমান উল্লাহ খান, আবদুল্লাহ আল হারুন এবং আমি তাঁকে একটি খোলা চিঠি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে চিঠিটা হবে বেনামি এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম থাকবেনা। কারণ তাতে গ্রেপ্তারের যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল। এই ইস্তাহারটি আমরা আন্দরকিল্লাস্থ রহমানিয়া প্রেস থেকে ছাপাই। অন্যকোন প্রেস এটা ছাপাতে রাজী হয়নি। এখানে উল্লেখ করা ভাল, রহমানিয়া প্রেসের মালিক ফরমান উল্লাহ খানের আত্মীয় ছিল। ...নির্দেশ মোতাবেক প্রিন্সিপ্যাল আবু হেনা সাহেব কয়েকজন প্রফেসরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু কমিটি কয়েকবার মিটিং করেও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। পরে জানা যায় যে ফরমান উল্লাহ খানের একজন প্রফেসর আত্মীয় ফরমান উল্লাহ খানের নাম বলে দেয়। ফরমান উল্লাহ ও শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইছহাককে এজন্য শাস্তি প্রদান করা হয়। এবং আই এ'এর পর বিএ-তে

> তাদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়। সামশুদ্দিন মোহাম্মদ ইছহাক সেই সময় যদিও পরোক্ষভাবে তমদ্দুন মজলিসের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু এই ইস্তাহার ছাপানো এবং বিলির ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা ছিল না তবুও তাঁকে এই শাস্তি কেন প্রদান করা হলো এখনো আমাদের কাছে রহস্যাবৃত (হক, ১৯৯৩)।

এই ঘটনার পর প্রগতিশীল ছাত্ররা দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়। যার ফলে তারা "ইনডিপেন্ডেন্ট ষ্টুডেন্ট অর্গানেইজেশন" নামে একটি ছাত্র জোট গড়ে তোলেন, যার সভাপতি ছিলেন আবদুল্লাহ আল হারুন এবং সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ আলী ও ফরিদউদ্দীন আহমদ। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" রাখা হয়। উপরিউল্লিখিত তিনজনকেই আহ্বায়ক করে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। এ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন গোলাম আকবর চৌধুরী, এম. এ. হালিম, আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল হাই, ফরমানউল্লাহ খান, এ. এন. এম. নূরুন্নবী প্রমুখ। এ কমিটি ৫৪ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। সংগঠনটির ছাত্ররা চৌধুরী হারুনর রশিদ ও এম. এ. আজিজের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন (হারুন, ১৯৯৩)।

চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদে এ সময় চট্টগ্রামের জনপ্রিয় *সাপ্তাহিক কোহিনূর* পত্রিকায় একটি মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সেটি ছিল উর্দু ভাষার বিকল্প হিসেবে। *সাপ্তাহিক কোহিনূর*-এর ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যার সম্পাদকীয় কলামে এ বিষয়ে মতামতটি প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, উর্দু কোনোপ্রকারেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। কেননা, পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা উর্দু নয়। যদি কোনো প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হয়, তবে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। কেননা, পাকিস্তানের অধিবাসীর অর্ধেকেরও বেশি লোক বাংলা ভাষাভাষী (*কোহিনূর*, ১৯৫১, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৭৯)।

বাংলা ভাষার দাবিতে যখন সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, ঠিক তখনই *কোহিনুর* পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষার সমর্থনে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে আন্দোলনে গতি এনে দেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে মতিউল ইসলাম রচিত 'বাংলা ভাষা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এতে লেখক রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনে সম্মিলিতভাবে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে লিখেন:

বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা
বাংলাই সে সবার আশা
বাংলা ছাড়া উপায় কারো নাই
সম্মিলিত বজ্র রবে
তোলো আওয়াজ বলো সবে
(অন্যতম) রাষ্ট্রভাষা হওয়া চাই।
(*কোহিনূর*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৮১)

'বাংলা ও বাঙ্গালী' কবিতায় মোতাসিম বিল্লাহ বাংলা ভাষাকে যে হিন্দুয়ানি ভাষা বলা হয়, তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, এটা হিন্দু ও মুসলমানদের নয়, সমগ্র বাঙালির ভাষা। কবিতাটিতে তিনি বলেন:

এ দেশ, এ ভাষা, হিন্দুর নয়
নয় তা' মুসলমানের
দুই জাতি মিলে সৃষ্টি করলো
এখানে অযুত গানের।

হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়,
তুমি 'বাঙালী' এই পরিচয়ঃ
তা'হলে তাহার ভাষা আর প্রাণ কেন বা করছো ধ্বংস?
(*কোহিনূর*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ১৩৩)

এরপর শুরু হয় ১৯৫২ সালের উত্তাল আন্দোলন। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দায়িত্বগ্রহণ করে ২৬শে জানুয়ারি তিনি পূর্ব-বাংলা সফরে আসেন এবং ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় বলেন, "কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তিনি ঘোষণা দেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু" (হোসেন, ২০০৮, পৃ. ২০৯)। উপস্থিত ছাত্র-জনতা সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ওই দিনের সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ৩১শে জানুয়ারি আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সভার মাধ্যমে ধর্মঘট সমর্থন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতালের ঘোষণা দেওয়া হয় (হোসেন, ২০০৮, পৃ. ২০৯-১০)। শুরু থেকেই ঢাকার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ রেখে চট্টগ্রামে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ইতঃপূর্বে গঠিত 'মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম কমিটি' ছিল চট্টগ্রামের ভাষা আন্দোলনসহ সকল কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। কিন্তু আন্দোলনের প্রয়োজনে ১৯৪৮ সালে গঠিত 'মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম কমিটি' পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে চট্টগ্রামে জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তখনকার তরুণ সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম চৌধুরী এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন চৌধুরী হারুনর রশিদ ও এম. এ. আজিজ (চৌধুরী, ১৯৯৩)। আন্দরকিল্লায় অবস্থিত আওয়ামী লীগের অফিস ছিল সংগ্রাম পরিষদের দপ্তর। সকল শ্রেণির পেশাজীবী সংগঠন, কৃষক-শ্রমিক সংগঠন, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিনিধিদের এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমউদ্দীনের ভাষণের কঠোর সমালোচনা করে *কোহিনূর* 'রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য লিখে:

> উজিরে আযমের সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গ সফরের সময় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পূর্ববঙ্গবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগিয়াছে। যখন তিনি পূর্ববঙ্গের উজিরে আযম ছিলেন তখন বঙ্গ ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার পত্রে দস্তখত দিয়াছিলেন। এখন তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের উজিরে আযমের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহার অঙ্গীকার বিস্তৃত হইছে বলিয়া মনে হয়। নতুবা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। পাকিস্তানের ৪ কোটি অধিবাসীর মনে নিদারুণ আঘাত হানিয়া তাঁহাদের উপর জোরপূর্বক ভূত চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালীরা এখন এত বোঝার চাপ সহ্য করিবে কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়। সহ্য করিতে না পারিলে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় আছে। (*কোহিনূর*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৯৫)।

সর্বদলীয় ঐক্যের ঘোষণা ছিল; যে মূলনীতিতে ভাষার অধিকার নেই, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নেই, তা আমরা মানি না, মানবো না। কেন্দ্রের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতালকে সফল করার জন্য অন্যান্য জেলার মতো সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে মিটিং, মিছিল এবং লালদীঘি মাঠে

জনসভার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচির প্রস্তুতি পর্যায়ে সার্বক্ষণিক কাজ করেছেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও আজিজুর রহমান (লাল আজিজ নামে পরিচিত)। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই দুইজন ১৯শে ফেব্রুয়ারি ডক শ্রমিকদের সংগঠিত করে বক্তব্য রাখেন। এরপর মাহবুব উল আলম চৌধুরী জলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২০শে ফেব্রুয়ারি তার অনুপস্থিতিতে চৌধুরী হারুনর রশিদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও কমিটির সমস্ত কার্যক্রম তাঁকে নিয়মিত অবহিত করা হতো এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়া হতো (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ৩০)। আন্দোলনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ভূমিকার প্রশংসা করে তৎকালীন ছাত্রনেতা এমদাদুল ইসলাম বলেন, "১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত চট্টগ্রামের ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল" (ইসলাম, ১৯৯৩)।

১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতদিন পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগানো হয়। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব সংগঠনগুলো ৩১শে জানুয়ারি ঘোষিত ২১শে ফেব্রুয়ারির হরতাল সফল করার প্রস্তুতি নেয়। কর্মসূচি অনুযায়ী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করা হয়। ঐ দিন সমস্ত দোকানপাট, যানবাহন, সরকারি অফিস আদালত ও স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। চট্টগ্রাম শহরের সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতালে অংশগ্রহণ করে। সরকারি অপপ্রচার ও পুলিশের হয়রানি উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের হাজার হাজার কর্মী হরতালের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ঐ দিন লালদীঘির ময়দানের পূর্ব-নির্ধারিত জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে খন্দকার ইলিয়াস পূর্বাহ্নে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছান। তিনি ঢাকার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অজুহাতে ঢাকায় ছাত্র মিছিলে গুলি চালানো হয়েছে। এতে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র জনতা শহিদ হয়েছে (মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মৃতিচারণ)। এ খবর চট্টগ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে গোটা শহর বারুদের মতো জ্বলে ওঠে। মিছিলের পর মিছিল চতুর্দিক থেকে পুরাতন ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের দিকে যেতে থাকে। জহুর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মিছিল এবং রেল-শ্রমিকদের একটি বিশাল মিছিল ইনস্টিটিউটে জমায়েত হয়। চট্টগ্রাম কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মিছিলও জড়ো হয় সেখানে। সম্মিলিত বিশাল মিছিলটি এম. এ. আজিজ ও জহুর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। মিছিলের স্লোগান ছিল: "ঢাকায় গুলিতে হত্যার বিচার চাই, খুনীদের বিচার চাই, জুলুমের প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, জুলুম বাজি চলবেনা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ইত্যাদি (*দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯৯৫, অমর একুশে সংখ্যা)।

২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় রক্তপাতের খবর চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর পরই তরুণ সাহিত্যিক ও তৎকালীন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব মাহবুব উল আলম চৌধুরী রোগ শয্যায় 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসীর দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটি রচনা করেন। এটাই হচ্ছে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম কবিতা। কবিতাটির গুরুত্ব বর্ণনায় চৌধুরী জহুরুল হক বলেন, "মাহবুব উল আলম চৌধুরী রচিত এই কবিতাটিতে ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে অগ্নিক্ষরা বিদ্রোহী কণ্ঠই শুধু উচ্চারিত হয়নি, যাকে বলি একুশের চেতনা, স্বাধীনতার চেতনা, তারও দীপ্র দলিল রচিত হয়েছে। কেবল তাই নয়, এটিই ছিল একুশের চেতনবাহী সংগ্রামশীলতার প্রথম সৃজনশীল সাহিত্য স্মারক, একুশের প্রথম কবিতা, পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত একুশের প্রথম স্মরণিকা (হক, ২০০২, পৃ. ১১)। কবিতাটি

২২শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় লালদীঘি ময়দানের জনসভায় চৌধুরী হারুনর রশিদ উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের সামনে পাঠ করেন।

পরের দিন ভোরে কবিতাটি সংরক্ষণ, প্রকাশ, প্রচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কবিতাটির প্রকাশিত সকল কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কবিতা পাঠ করার কারণে চৌধুরী হারুনর রশীদ ও কবিতার মুদ্রিত কপি বহন করার কারণে কৃষ্ণ গোপাল সেনকে ২২শে ফেব্রুয়ারি রাতেই গ্রেফতার করা হয়। মাহবুব উল আলমের উপর হুলিয়া জারি করা হয় এবং বাড়ির সামনে পুলিশের পাহারা বসানো হয়। তিনি বোরখা পড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান। মাহবুব উল আলম চৌধুরী বলেন, কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করার এবং পুলিশি নির্যাতনের কারণে কবিতাটির কোনো কপি তিনি হাতে রাখতে পারেননি বা সংরক্ষণ করতে পারেননি। তখন চট্টগ্রামে পুলিশের একজন কলেজ পড়ুয়া বোন মনজুরা বেগম কবিতাটি সংরক্ষণ করেন। পরে সংস্কৃতি কর্মী মফিদুল হকের মাধ্যমে মনজুরা বেগম তার পুরানো ডায়েরিটি[১] আমার কাছে পৌঁছে দিলে সেই কবিতাটি আমি ফিরে পাই (*দৈনিক পূর্বকোণ*, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)।

কবিতাটি প্রচারের কথা স্বীকার করে কৃষ্ণ গোপাল সেন উল্লেখ করেন:

> বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হওয়ায় এখনো আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। কারণ সেদিন চট্টগ্রাম শহরের হরতাল পরিচালনা করা ও লালদীঘি ময়দানের জনসভায় শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল মূলত আমার উপর। আমি সফলতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছি, কিন্তু পরের দিনের হরতাল দেখার সুযোগ আমার হয়নি। ২২শে ফেব্রুয়ারি ভোরে কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর লেখা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতার মুদ্রিত কপি নিয়ে প্রচার করার মুহূর্তে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। এক বছর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে বন্দি অবস্থায় থাকতে হয় (সেন, ১৯৯৩)।

২১শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ লালদীঘির ময়দানের জনসভা শেষে পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য ঐ দিন রাতে আন্দরকিল্লাস্থ অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হন। সভায় শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য দমননীতির নিন্দা প্রকাশ করে বিভিন্ন বক্তব্য রাখা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ৩৫)।

ক. ঢাকার আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি রেখেই তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন; এবং
খ. ২২, ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ, হরতাল, জনসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে।

২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঢাকার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর চট্টগ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে গোটা শহরে ক্ষোভ ও শোক ছড়িয়ে পড়ে। মিছিল ও স্লোগানে সমগ্র শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলকারীরা 'নুরুল আমিনের রক্ত চাই', 'নাজিমুদ্দীন গদী ছাড়' প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকে। পরে লালদীঘি ময়দানে সমবেত হয়ে তারা এক সমাবেশের আয়োজন করে (*দৈনিক আজাদ*, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)। এ দিন চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের নেতা এজাহার, মাকসুদুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে একটি বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে ডা. খাস্তগীর স্কুলের কিছু ছাত্রী এসে যোগ দেয়। মিছিলটি অর্পণাচরণ স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে আরো কিছু মেয়ে মিছিলে যোগ দেয়। মেয়েদেরকে

একটি ট্রাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্যরা পেছনে সাইকেল চেপে বা কেউ পায়ে হেঁটে মিছিলটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী, ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, বিশিষ্ট আইনজীবী এম. ওমর হায়াত বলেন:

> আমার মনে পড়ে চট্টগ্রামের সেই বিশাল বিক্ষোভ মিছিলটি নিয়ে আমরা কদমতলী হয়ে দেওয়ানহাট পর্যন্ত গেলাম। ফিরে আসলাম পাঠানটুলির ভিতর দিয়ে। ওই মিছিলে যে-সব মেয়েরা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হালিমা খাতুন, রহিমা খাতুন ও আনোয়ারার কথা মনে করতে পারি। আনোয়ারা প্রকাশ খুকু বাংলা ভাষার বিশিষ্ট গবেষক মরহুম ড. মাহফুজুল হকের স্ত্রী। এমনকি সেদিনকার সারা শহরে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত পোস্টারে সয়লাব হয়ে যায়। 'খুনী নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি বক্তব্য পোস্টারে স্থান পায়। সন্ধ্যার পর সমস্ত জনতা উপরোক্ত শ্লোগান দিয়ে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। (*দৈনিক আজাদ*, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় নিহত একুশের শহিদদের নাম জানার পর তাদের নামে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রাস্তার নামকরণ করা হয়। বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *সাপ্তাহিক কোহিনূর* 'ঢাকা শহরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে সংবাদ প্রচার করে (*কোহিনূর*, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১০৯)।

বাংলা ভাষার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে এ সম্পর্কে *কোহিনূর* সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখে, ব্রিটিশরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র বা কথা উত্থাপন না করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমিতি নিষিদ্ধ করতো। এমনকি ৫ জনের সংযোগ বেআইনি বলে ঘোষণা করেছিল। এই আইন অমান্য করলে কাঁদুনে গ্যাস, বোমা ও গুলি ছোড়া হতো। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর জনপ্রতিনিধিরাই যেখানে দেশের শাসনভার চালাবেন সেখানে ১৪৪ ধারার কোন প্রয়োজন আছে বলে এ পত্রিকা মনে করে না এবং এই বেআইনি আইন ১৪৪ ধারা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। একই সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সাথে তুলনা করে 'নৃশংস ছাত্র হত্যা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে (*কোহিনূর*, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১০৯)।

তৎকালীন পত্রিকার উপর সরকারি বিভিন্ন দমন আইনকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষার পক্ষে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে *কোহিনূর* পত্রিকা জনসাধারণের মাঝে এর অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার পর এ পত্রিকা বিভিন্ন সংবাদ শিরোনাম এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে ঢাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরে। শুধু তাই নয় পত্রিকার প্রচলিত পৃষ্ঠা সজ্জারীতি ভঙ্গ করে পত্রিকার শুরুতেই ভাষা আন্দোলন বিষয়টাকে পাদ প্রদীপের আলোয় উপস্থাপন করে 'নিরপেক্ষ বিচার দাবি করিতেছি' শিরোনামে প্রকাশিত হয় (*কোহিনূর*, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১০৯)।

একুশে ফেব্রুয়ারির স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে চট্টগ্রামের নারীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে নারীদের রাস্তায় বের হয়ে মিছিল করা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। তাদের পাশাপাশি কিছু কিছু পুলিশ অফিসারের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। চট্টগ্রামে একুশের সেই উত্তাল দিনটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় অগ্রসেনানী মাহবুব হাসান। তিনি বলেন:

> বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মিছিল বের হয় চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। মিছিল আসে ডা. খাস্তগীর স্কুলের সামনে। স্কুলের ফটক জুড়ে ছিল পুলিশের জীপ এবং ছাত্রীরা যাতে মিছিলে যোগ দিতে না পারে, সেজন্য স্কুল ফটক ভেতর থেকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ছাত্রীরা রাজপথে বেরিয়ে আসতে পারছিলনা। ছাত্র নেতারা ফটক ভাঙ্গার চেষ্টা চালায় এবং ব্যর্থ হচ্ছিল। ব্যর্থতা তাদের পেয়ে বসছিল প্রায়। ঠিক তখনই জীপ গাড়ি থেকে পুলিশ অফিসার তার জীপের হ্যাণ্ডেলটি তুলে দেন ছাত্র নেতাদের হাতে, তালা ভাঙতে ... (হাসান, ১৯৯৩)।

ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র যে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, তা চট্টগ্রামের গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত আঘাত হেনেছিল। চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন থানা শহরেও ছাত্র জনতা স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে।

সন্দ্বীপ হাবিলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদিন শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালিত হয়। বিকালে স্থানীয় মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবিতে বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

সীতাকুণ্ড থানা শহরেও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনমনে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি এখানে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। সকালে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং বিকেলে জনসভার আয়োজন করে (*দৈনিক* সৈনিক, ১৬ই মার্চ, ১৯৫২)। সভায় বক্তারা শাসকচক্রের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

নাজিরহাট, ফটিকছড়িতেও ঐদিন সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐ এলাকার কর্মসূচি সফল করার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ছাত্রকর্মী এমদাদুল ইসলাম ও আবু জাফর চৌধুরী। ঘটনার উল্লেখ করে এমদাদুল ইসলাম বলেন, ঐ দিন আমার ও আমার বন্ধু আবু জাফর চৌধুরীর উপর নাজিরহাট ও ফটিকছড়িতে কর্মসূচি সফল করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। হাজারখানেক লোকের এক মিছিল ও মিছিল শেষে একটি সভা হয়েছিল নাজিরহাটে। মুসলিম লীগের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও নাজিরহাটের হরতাল পুরোমাত্রায় সফল হয়েছিল (ইসলাম, ১৯৯৩)।

একুশে শহিদদের স্মরণে প্রথম শহিদ স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত হয়েছিল চট্টগ্রামে। খুরশীদ মহল সিনেমা হলের সামনে অবস্থিত বর্তমান পেট্রোল পাম্প এলাকা তখন লালদীঘি ময়দানের অংশ ছিল। সেখানে (তখন ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে একটি পার্ক ছিল) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নেতা-কর্মীরা ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালের মধ্যে ছোটোখাটো স্মৃতিস্তম্ভ (শহিদবেদির আঙ্গিকে) তৈরি করেছিলেন। এদিন হরতাল-সমাবেশের পাশাপাশি এই স্মৃতিস্তম্ভে কিছু কিছু পুস্পস্তবকও পড়েছিল। কিন্তু দু'একদিন পর পুলিশ এসে তা ভেঙে দেয়। এ প্রসঙ্গে ভাষা সৈনিক মাহবুব উল আলম বলেন, "ঢাকায় কিন্তু স্মৃতিস্তম্ভ হয়েছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারি। আমাদের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙ্গে দেয়ার পর ঠিক করা হয়েছিল ঐখানেই অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া পার্কেই শহীদ স্মৃতি সৌধ গড়ে তুলবো। কিন্তু তখন কি কারণে জানি না মিউনিসিপ্যালিটি ঐ জায়গাটি ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দিল, ফলে ওখানে আর স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।" (চৌধুরী, ১৯৯৩)।

২৩শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে অসংখ্য শোকমিছিল বের হয়। তাছাড়া ২৪ তারিখ হরতাল ও জনসভা সফল করার লক্ষ্যে সারাদিন প্রচারকার্য চালানো হয়। ঘোড়ার গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বা কখনো কখনো চোঙ দিয়ে মিছিল সহকারে প্রচার কাজ চলেছিল এবং পাশাপাশি ব্যাপকভাবে পোস্টারিং ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। ১৯৫২ সালের জুন মাসে তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস" নামক পুস্তিকার প্রচ্ছদে ঐ মিছিলের তিনটি ছবি ছাপানো হয় (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ৩৭)।

২৪শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র জেলাব্যাপী পূর্ণ-দিবস হরতাল পালিত হয় এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ তারিখ বিকাল ৪টায় লালদীঘি ময়দানে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লক্ষাধিক জনতার সমাবেশ ঘটে। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভক্তির পর লালদীঘি ময়দানে এটা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী বিশাল গণসমাবেশ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা সভাপতি মোজাফফর আহমেদ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জহুর আহমেদ চৌধুরী, চৌধুরী হারুনর রশিদ, অধ্যাপক সুলতানুল আলম চৌধুরী ও তমদ্দুন মজলিস নেতা আজিজুর রহমান। এছাড়া মুসলিম লীগ নেতা রফিকউদ্দীন সিদ্দীকী ও এ. কে. খান এতে বক্তব্য রাখেন (রহমান, ১৯৯৩, পৃ. ২০২)।

কবি আবদুস সালাম (১৯০৮-১৯৮৭) সম্পাদিত *দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান* পত্রিকাটি ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) কর্তৃক সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জুগিয়েছিল। তবে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর (কবি আবদুস সালামের) যে গভীর অনুরাগ ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মুহূর্তের কিংবা তার পূর্ববর্তী বা অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির কোনো কপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু ৩০শে জুলাই ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে বাংলাভাষার পক্ষে পত্রিকাটির জোরালো সমর্থন লক্ষ করা যায়। '*দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান* কেন মোহাম্মদ আলীকে সমর্থন করে' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

> মাতৃভাষা প্রত্যেকটি লোকের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। ইহার প্রমাণ, বিগত ভাষা আন্দোলনে নাজিমী ঔদ্ধত্যের নিকট মাতৃভাষা বাংলার দাবীকে বিসর্জ্জন না দিয়া বাংলার যুবজনতা দিয়েছে প্রাণ। এই মহান আত্মদানের নেকট অবশেষে নিজামী বেয়নেট মাথা হেট করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ...গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে যতদিন বাঙালি জীবিত থাকিবে, ততদিন এমন কোন তৈমুর চেঙ্গিস নাই, যে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী হইতে বিচ্যুত করার দুঃসাহস করিবে। ...তিনি যদি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করিতে পারেন, তবে তিনি বাংলার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন (*দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান*, সম্পাদকীয়, ৩০শে জুলাই ১৯৫৩)।

২৫শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ছাত্রীদের স্বতন্ত্র মিছিল। ঐ দিন চট্টগ্রাম কলেজ ও স্থানীয় মহিলা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীরা লরি ও বাসে করে 'মন্ত্রীসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। চট্টগ্রামের ইতিহাসে মহিলাদের এ ধরনের স্বতন্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন এটাই প্রথম, পরে এক সমাবেশে ছাত্রীরা ঢাকায় পুলিশের গুলি বর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবি করে। গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা হয় (*দৈনিক আজাদ*, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

২৮শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে আবার হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে ছাত্ররা শহরে জমায়েত হয় এবং এক মাইল দীর্ঘ

শোকমিছিলের মাধ্যমে শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন পুনরায় চট্টগ্রামের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা খালি পায়ে এক বিরাট মিছিল বের করে এবং 'মন্ত্রীসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণ করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে (*দৈনিক আজাদ*, ২রা মার্চ, ১৯৫২)।

১৯৫২ সালের ৫ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সমগ্র পূর্ববাংলায় শহিদ দিবস পালিত হয়। সেদিন পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে বড়ো জনসভা হয় চট্টগ্রামে। লালদীঘি মাঠে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মোজাফফর আহমেদ। বক্তৃতা করেন জহুর আহমেদ চৌধুরী, মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, এম. এ. আজিজ, আজিজুর রহমান প্রমুখ। সভার পর এক বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলকারীরা লালদীঘি পার্ককে 'রাষ্ট্রভাষা শহীদ পার্ক', লয়েল রোডকে 'শহীদ সালাউদ্দিন রোড', টেরিবাজার রোডকে 'শহীদ বরকত রোড', লাভলেনকে 'শহীদ জব্বার রোড', এমপ্রেস রোডকে 'রাষ্ট্রভাষা শহীদ রোড' নামে অভিহিত করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। সংগ্রাম কমিটির কর্মীরা দলে দলে বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে পরিবর্তিত নামগুলো ঘোষণা করে এবং চট্টগ্রাম পৌরসভাকে এই ঘোষণা কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে (চৌধুরী, ২০১৩, পৃ. ১২৫)।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ৮ই মার্চ থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ধীরে ধীরে ক্লাসে যোগ দেওয়া শুরু করে। এতে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত চট্টগ্রামের উত্তাল আন্দোলন ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে। মাতৃভাষা তখন জাতিসত্তার অস্তিত্বের প্রশ্নে আপামর জনসাধারণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতকর্মীরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি, গ্রামে-গঞ্জে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতাকেও তারা সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা চালায়। এভাবে কেন্দ্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

উপসংহার

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ ভাষা আন্দোলনের (১৯৪৮-১৯৫২) সময়কালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলা ভাষার স্বপক্ষে এবং পাকিস্তানি সরকারের উর্দুকীকরণের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের এ-সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখনী, সম্পাদকীয়, প্রতিক্রিয়া, কবিতা বাংলা ভাষার পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করেছিল। সংবাদপত্রের পাশাপাশি চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও লেখনীর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল। চট্টগ্রামের ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনতা ভাষার দাবিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্রগুলি নিজস্ব প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় মতামত, কবি, সাহিত্যিক তথা সর্বস্তরের জনগণের লেখনী প্রচার করে ভাষা আন্দোলনকে গণদাবিতে পরিণত করেছিল, যার ফলে ক্ষমতাসীন সরকার বাংলা ভাষার দাবির পক্ষে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ভাষা আন্দোলনের এ সাফল্য পরবর্তী সময়ে বাঙালিকে ন্যায্য দাবি আদায়ে সাহস জুগিয়েছিল।

টীকা

১. ১৯৫৫ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি এ দু'দিন মনজুরা বেগম লাল কালি দিয়ে কবিতাটি ডায়েরিতে তুলে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনজুরা বেগম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের' কথা স্মরণ করে বললেন:

একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কবিতাটি নিয়ে আবার ভয় পেয়েছিলাম। তখন আমরা ও ভাবীরা একসাথে থাকি। মফিদুল ছাত্র ইউনিয়ন করত। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করত। তাই ভয় হতো, পাক বাহিনী এসে বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে কবিতাটি যদি দেখতে পায় তাহলে ঝামেলা হবে। তাই '৭১ সালে ডায়েরীটা আবার লুকিয়ে রেখেছিলাম। '৫২ থেকে '৭১ এই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেশ স্বাধীন হলো। আমি খেলাঘরের সাথে জড়িত ছিলাম। বহুবারই খেলাঘরের কর্মীরা বলেছে, খালাম্মা, চলুন আমরা সবাই মিলে কবিতাটি বাংলা একাডেমীতে জমা দিয়ে আসি। কিন্তু যাই যাই করে আর যাওয়া হলো না। হঠাৎ একদিন সম্ভবতঃ '৮৭ সালে টেলিভিশনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার দেখলাম। ভদ্রলোক বললেন যে, কবিতাটি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মাত্র ৪ লাইন মনে আছে। তাই আমি চট্ করে ডায়েরীতে কবিতাটির পাশে ভদ্রলোকের নামটা লিখে রাখলাম। পরে মফিদুলের মাধ্যমে তাঁর কাছে কবিতাটি পাঠিয়ে দিলাম। (বেগম, *দৈনিক পূর্বকোণ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)।

তথ্যসূত্র

আলী, সৈয়দ মুজতবা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। *পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা*। চট্টগ্রাম: বইঘর।

চৌধুরী, নাসিরুদ্দিন (প্রধান সম্পাদক, ২০১৩)। *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*। চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী (কার্তিক-পৌষ, ১৪০২)। 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম : রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট'। ঢাকা: *একাডেমি পত্রিকা*।

মতিন, আবদুল ও অন্যান্য (১৯৯২)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

মুসা, মনসুর (সম্পা. ১৯৭৪)। *বাঙলাদেশ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

রহমান, সাঈদ-উর (২০০১)। *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-৮২)*। ঢাকা: অন্যান্য প্রকাশ।

রহমান, ডা. মাহফুজুর (১৯৯৩)। *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*। চট্টগ্রাম: বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র।

হক, আব্দুল (১৯৭৬)। *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*। ঢাকা: অবসর ।

হক, চৌধুরী জহুরুল (২০০২)। *প্রসঙ্গ : একুশের প্রথম কবিতা*। চট্টগ্রাম: কোহিনূর প্রকাশন।

হোসেন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার (২০০৮)। *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫-১৯৭১*। ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।

পত্রিকা

দৈনিক আজাদ (১৯৪৭), ৩০শে জুন, ১৯৪৭, *দৈনিক আজাদ* (১৯৫২), ২২, ২৪, ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি।

সাপ্তাহিক কোহিনূর (১৯৫১) ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, *সাপ্তাহিক কোহিনূর* (১৯৫২), ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দৈনিক সৈনিক (১৯৫২), ১৬ই মার্চ।

দৈনিক ইত্তেহাদ (১৯৪৭), ২৭শে জুলাই।

দৈনিক আজাদ (১৯৪৭), ২৯শে জুলাই।

দৈনিক ইনসাফ (১৯৫২), ২৩শে জুন।

দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান (১৯৫৩), সম্পাদকীয়, ৩০ জুলাই।

দৈনিক ইনকিলাব (১৯৯৫), অমর একুশে সংখ্যা।

'চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এম. এ. হালিমের স্মৃতিচারণ'। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মৃতিচারণ'। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক মাহবুব হাসানের স্মৃতিচারণ'। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক কৃষ্ণ গোপাল সেন-এর স্মৃতিচারণ'। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক আবদুল্লাহ হারুন-এর স্মৃতিচারণ'। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক এমদাদুল ইসলাম-এর স্মৃতিচারণ'। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক এজহারুল হকের স্মৃতিচারণ'। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।